জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ থেকে দারিদ্র ও উন্নয়ন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি*

১. পটভুমি, ২. সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগের রূপ;
৩. দারিদ্রের প্রত্যয়; ৪. দারিদ্র্যের মোকাবিলা; ৫. অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন দর্শন;
৬. উপসংহার

১.
পটভূমি

এদেশে দারিদ্র বিমোচনের নামে অনেক প্রচেষ্টা চলছে, কিছু সরকারী প্রচেষ্টা এবং অনেক বেসরকারী, মূলত: 'এন,জি,ও' প্রচেষ্টা। এসমস্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশে বিভিন্ন জায়গায় দারিদ্র বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কিছু হচ্ছে অবশ্যই। কিন্তু এধরণের প্রচেষ্টার দুইটা প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়ঃ

প্রথমতঃ এধরণের প্রচেষ্টা বাইরের বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিচালিত হয় বলে এগুলোর ওভারহেড্ খরচ সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশি। এই সব সংস্থার খরচ যোগানো হয় মূলত: বিদেশি সাহায্য দিয়ে যার জন্য এভাবে দেশের দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ যাদের উপকারের জন্য এসমস্ত প্রকল্প নেয়া হচ্ছে তাদের কাছে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নেই, যার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সম্পর্কটা পেট্রণ-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের মতো যা তাদের সত্যিকার ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। একথা বোধ হয় বলা যায় যে, যে-সব এন,জি,ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের "দরিদ্র" আখ্যা দিয়ে তাদের "টার্গেট" করে - যে-ধরনের ভীষণ আপত্তিকর ভাষা অনেক এন,জি,ও-দের মধ্যেই চল্‌তি দেখা যায় - তারা এই মানুষদের আত্মশক্তিকে যেন "হত্যা" করে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা তাদের জীবনের অগ্রগতির জন্য পরনির্ভরশীলই থেকে যায়, এবং তাদের উপকার করবার জন্য একটি চাকুরিজীবি এলিট শ্রেণী বিকশিত হতে থাকে। দেশের সার্বিক ভাবমূর্তিও এই কারণে নেতিবাচক থেকে যায় - যেন এদেশের "দারিদ্র বিমোচনের" জন্য বাইরে থেকে সাহায্য করে যেতেই হবে।

দেশের মিডিয়া-সংস্কৃতির ভারসাম্যও দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিদেশি-অর্থায়িত এরকম সংস্থার কাজের কথা প্রচারের দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে। এছাড়া, সার্বিকভাবে, নেতিবাচক খবরই যেন পরিবেশন করবার মতো খবর এরকম একটা ধারণা যেন মিডিয়ার মধ্যে বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ইতিবাচক খবর পরিবেশন হয়, কিন্তু নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে দেশের ইতিবাচক সংবাদ খোঁজ করবার সংস্কৃতি এদেশের কেন, হয়তো অনেক দেশেরই মিডিয়া সংস্কৃতিতে তেমন দানা বাঁধে নি। তা ছাড়া দেশের মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সাংসদদের বক্তৃতা ও ফটো ছাপবার বা দেখাবার জন্যেও তো মিডিয়াতে অগ্রাধিকার হিসাবে জায়গা রাখতে হবে!

স্বাধীনতার পরও এদেশের মিডিয়াতে এই সংস্কৃতিরই প্রভাব দেখা যায়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন-প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রেরণায় দেশের ছাত্র-তরুণ সমাজ সহ নানান্ শ্রেণীর মানুষ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা না করে উন্নয়নমূলক যে সব উদ্যোগ নেয়া শুরু করেছিল সে সব খবরের চাইতে দেশের নেতা-বুদ্ধিজীবিদের কথাই প্রচারমাধ্যমে অনেক বেশি স্থান পাচ্ছিল। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি প্রয়াত সাংবাদিক ওয়াহিদুল হকের সাহায্যে আমি ঢাকায় সাংবাদিকদের একটি অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন ডেকে সাংবাদিকদের দেশের এসমস্ত ইতিবাচক উদ্যোগের সংবাদ ছড়িয়ে দেবার গুরুত্ব আলোচনা করবার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রথম বা শেষ পাতায় বক্স করে ”ওরাও মাঠে কাজ করছে” এই ধরণের নানান্ সংবাদ বেরোতে থাকে। পরবর্তীতে এই সংবাদগুলো নিয়েই "যে আগুন জ্বলেছিল” নামে বইটা সম্পাদনা করা হয় যে বইটা দেশের সমাজ কর্মীদের কাছে সুপরিচিত।

সেই আগুন আমাকেও প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির রাস্তা ছেড়ে জনগনের আত্মউন্নয়নের পথসন্ধানে হাতছানি দেয়। প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি তো আজও উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকার আর এন,জি,ও-দের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগকে তুলে ধরা এবং তাকে প্রণোদিত ও সাহায্য করবার কথা বলছে না। কিন্তু সরকার বা এন,জি,ওরা তো সারা দেশ জুড়ে দারিদ্র ও উন্নয়নের কাজ করে যেতে পারছে না, আর সুবিধাবঞ্চিত মানুষরাও সব জায়গায় তাদের প্রত্যাশী হয়ে বসে নেই। স্বাধীনতার প্রেরণায় যে উদ্যোগগুলি শুরু হয়েছিল ক্রমে বৈরি সামাজিক পরিবেশে, এবং এদের কয়েকটি অগ্রণী উদ্যোগ (যেমন ”রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলন” এবং ”গণমিলন”) শাসকগোষ্ঠিরই নিষ্ঠুর ভারী বুটের ও বেয়নেটের আঘাতে, বিলীন বা বিধ্বস্ত হযে যায়। কিন্তু দেশের নানা স্থানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নিজেরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিয়ে যেতে থাকে এবং আজো নিচ্ছে, যেগুলি নতুন শাসন ব্যবস্থায় মিডিয়ার সংস্কৃতি আমূলভাবে বদলে যাবার জন্য শিরোনাম পাওয়া দূরের কথা, বিশেষভাবে খোঁজ করবারও যোগ্য বলে আর তেমন বিবেচিত হয় নি।

কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের এরকম নিজস্ব উদ্যোগ থেকে দেশে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখবার আছে, এই মানুষগুলি সম্বন্ধে আমাদের কৃপা ও পেট্রনসুলভ দৃষ্টি বদলে তাদের দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে, তাদের উদ্যোগগুলি শুধু সারা দেশকেই জানানো নয়, সারা বিশ্বকে জানানো প্রয়োজন। দারিদ্র ও বঞ্চনা মানব-সভ্যতার একটি বিশ্বব্যাপী কলঙ্ক এবং এই কলঙ্ক ঘোচাবার জন্য শুধু ওপর থেকে পথ-সন্ধান না করে, একটা পেশা হিসাবে দারিদ্র-বিমোচনমূলক কাজের জন্য মানুষকে 'টার্গেট' না করে, এই মানুষরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে কোন্ দিকে পথ নির্দেশ করছে সেদিকেও তাকানো প্রয়োজন, এবং এই পথকে আরো প্রশস্ত করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাস থেকে দারিদ্র-গবেষণা সংস্থা রিইব বিশিষ্ট সাংবাদিক কুর্‌রাতুল আইন তাহ্‌মিনাকে দেশের গণমানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অন্যান্য সাংবাদিকদের নিয়ে সারা দেশে এরকম উদ্যোগ সন্ধান ক'রে তাদের খবর পরিবেশন করতে আহবান করে । এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুই বছর ধরে দেশের প্রায় ৭০ জনের মতো দেশপ্রেমী সাংবাদিকের নিরলস অনুসন্ধানের ফসল এই প্রতিবেদনগুলি যেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এরকম ৩২৪টি উদ্যোগের বিবরণ রয়েছে।

এই উদ্যোগগুলো সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য গুণের সঙ্গে দুটি প্রধান গুণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা হলোঃ (ক) মানুষের নিজস্ব জীবন-লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ; (খ) উদ্যোগগুলো বাইরের কোন আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল নয় (তবে তারা ব্যাংক ঋণ এবং জ্ঞানগত সহায়তা নিয়ে থাকতে পারে)।

এই উদ্যোগগুলির কাহিনি পড়লে এদের নায়ক-নায়িকাদের বিভিন্নরকম কঠিন জীবনাবস্থা ও জীবন সংগ্রামের কথা যেমন জানা যায় তেমনি জানা যায় এরকম জীবন-সংগ্রামের মোকাবিলায় তাদের সৃজনশীলতা ও সহিষ্ণুতার কথা, হাল ছেড়ে না দিয়ে কিংবা অনৈতিক পথে না গিয়ে জীবনে এগিয়ে যাবার বীরোচিত প্রচেষ্টা, অনেক ক্ষেত্রেই শুধু একার কথা চিন্তা না করে একই অবস্থার অন্য মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও তাদের প্রতিও সাহায্যের হাত বাড়ানো, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজে ত্যাগ স্বীকার করেও অপরকে ওপরে তোলবার চেষ্টা, এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌথ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উদ্যোগ নেবার কথা। আরো জানা যায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মহল থেকেও এরকম উদ্যোগকে সহায়তা করতে ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিংস্বার্থভাবে হাত বাড়িয়েছেন এরকম মানব-দরদীদের কথা। আর অর্থনীতিবিদ্‌দের মুলধারার শুধু টাকার সংখ্যা দিয়ে দারিদ্রের পরিমাপ করবার এবং দারিদ্র বিমোচনের হিসাব করবার প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে এরকম বেশ কিছু উদ্যোগ দেখাচ্ছে যে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মানুষদেরো 'মৌলিক চাহিদা' শুধু টাকা দিয়ে হিসাব করা যায় না, এবং তাদের নিজস্ব চাহিদাবলীর মধ্যে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে এই বিচারও বাইরে থেকে নির্দ্ধারণ করা যায় না - এই বিচার নিজ নিজ কঠিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের প্রত্যেকের

ব্যাক্তিগতভাবে নিজস্ব। একই সঙ্গে, এসমস্ত উদ্যোগ দারিদ্র-বিমোচন তথা উন্নয়নের কৌশল সম্বন্ধে কিছু দিক-নির্দেশ করে, এমনকি দর্শনগতভাবে দারিদ্র সমস্যাটিরই নতুন রূপ উন্মোচন করে যা দারিদ্র-বিমোচন ও উন্নয়ন-সংলাপের মুলধারায় তেমন স্বীকৃতি পায় নি।

এপথে আলোকিত হবার জন্য, এবং বিশেষ করে যাদের পক্ষে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অভাবী মানুষদের জীবনাবস্থা ও তাদের জীবন-স্বপ্নের সঙ্গে এবং স্বপ্ন-পুরণের নিজস্ব একক বা যৌথ প্রচেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের তেমন সুযোগ হয় নি তাদের জন্যে, এই প্রতিবেদনগুলি গভীরভাবে পড়া প্রয়োজন এই কাহিনিগুলির মধ্য দিয়েই তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। আমার এই ভূমিকায় এই উদ্যোগগুলির শুধু কয়েকটি বিভিন্নরকম প্রধান স্বরূপের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এই প্রতিবেদনগুলিতে কী আছে সে সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু প্রাথমিক স্বাদ দেবার জন্য, এবং এগুলি থেকে দারিদ্রের প্রত্যয় ও দারিদ্র বিমোচনের তথা উন্নয়নের পথনির্দেশ আলোচনা করবার সুবিধার জন্য।

২.

সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগের রূপ

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই ঘটনা - ১৯৯৬ সালে ঝিনাইদহের মহেশ্বরচান্দা গ্রামের চাষীরা একজন প্রগতিশীল নেতার নেতৃত্বে দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা (অনানুষ্ঠানিক ”গণগবেষণা” যে-ধারার কথা পরে আলোচনা করা হয়েছে) ক’রে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় জমির পুনর্বন্টন ক’রে আইল উঠিয়ে দিয়ে সব জমি লেভেল ক’রে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ ক’রে কৃষির উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে' দিয়ে, এবং অন্যান্য নানান্ দিকে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে, গ্রামে একটা আর্থসামাজিক বিপ্লবই ক’রে ফেলেছে।

গাইবান্ধার সাহাপাড়া ইউনিয়নের দেশপ্রেমী চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়নের বাসিন্দারা প্রতি বছর পাবলিক মিটিং-এ ইউনিয়নের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। বিশ্বাস না হলেও সত্যি যে এই আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে এই ইউনিয়নে রাজনৈতিক কোন্দল-সন্ত্রাস মুছে গেছে।

সরকারি কৃষি-বিজ্ঞানি ও উদ্যোগী কৃষক-মজুরদের মিলনে কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন কাহিনি - বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা এলাকার কৃষকরা ”কৃষি ক্লাব” গঠন করে, এবং তাদের আহ্বানে কৃষি অফিসাররা সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন জমিতে সর্বোচ্চ ফলন ব্যাপারে পরামর্শ দেন। এই উদ্যোগর ফলে ১৯৮৮ থেকে ২০০২-এর মধ্যে এই অঞ্চলের জমির ফলন পাঁচগুনের মতো বেড়ে যায়। উদ্যোগটি ছড়িয়ে আজকে

বাঘারপাড়া উপজেলায় মোট ২২টি কৃষি ক্লাব জন্ম নিয়ে এলাকার কৃষি উৎপাদনের বৈপ্লবিক অগ্রগতির ধ্বজা ওড়াচ্ছে। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়নের চুহড় ব্লকের যে ভূমিহীন শ্রমিকরা সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটনীর পর দিনের শেষে শুধু মরিচ দিয়ে ভাত খেত, তারা সেখানকার সেবাপরায়ন কৃষি ব্লক অফিসারের অক্লান্ত বাড়ী বাড়ী যেয়ে পরামর্শ ও শিক্ষায় প্রণোদিত হয়ে এবং তাঁর নিরলস তত্ত্বাবধানে তাদের ছোট্ট ভিটেগুলিতেই এবং আশেপাশের পুকুরে-ডোবায়, প্রতি ইঞ্চি খালি জায়গায়, সবজী-হাঁস-মুরগী-মাছ উৎপাদন শুরু করে, এবং কচুরীপানা-গাছের-ডাল-পচা-পাতা ইত্যাদি ধাপে ধাপে সাজিয়ে তার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাসায়নিক সার মিশিয়ে উঁচু মানের কম্পোষ্ট সার তেরী করে যে সার আশেপাশের নানান অঞ্চলের চাষীরা এসে চড়া দামে কিনে নিয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে শুরু এই উদ্যোগে প্রায় ১২০০ ভূমিহীন পরিবার মেতে উঠেছে এবং তাদের আয় ও জীবনের মান অনেক বেড়ে গেছে, এবং তাদের জীবনের এই পরিবর্তন দেখে চুহড় ব্লকের বাইরে অন্যান্য কয়েক এলাকাতেও ভূমিহীনরা নিজেরাই এরকম উদ্যোগে নেমে গেছে প্রয়োজনমতো এই সেবাপরায়ন ব্লক অফিসারকে ডেকে তাঁর পরামর্শ নিয়ে ।

ইলিয়টগঞ্জের ধানখোলা গ্রামের একজন কৃষক গ্রামের ৫২ জন চাষীকে তাদের জলাবদ্ধ কৃষি জমিতে বর্ষা মৌসুমে যৌথ মাছ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং সংগঠিত করে "নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান" এই শ্লোগান দিয়ে মৎস্য বিপ্লব করেছেন। এই উদ্যোগ চাষীদের মধ্যে যে সচ্ছলতা এনে দেয় তা দেখে মাছ চাষের এই যৌথ প্রযুক্তিটিও এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কুমিল্লার তিনটি উপজেলায় প্রায় ৫০টি অত্যন্ত লাভজনক যৌথ মাছ চাষ প্রকল্প চলছে যাদের মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত বড়ো আকারের, যাদের একটিতে সাতটি গ্রামের ৩৫০ জনের মতো চাষী জমি একত্র করে যৌথ মাছ চাষ করছে।

ব্রাহ্মনবাড়িয়ার নাসিরনগর এলাকায় একজন নিম্ন আয়ের ডিম বিক্রেতা অভিনব পদ্ধতিতে হাঁসের 'বর্গা'-চাষ শুরু করেন - উজান এলাকায় পানি কমে ভাটি এলাকায় নেমে গেলে উজান এলাকার কৃষকরা তাদের হাঁস ভাটি এলাকার চাষীদের কাছে লীজ দেন, আর উজান এলাকায় আবার পানি বাড়লে ভাটি এলাকায় হাঁস চাষীরা তখন উজান এলাকার চাষীদের কাছে ফিরে হাঁস বিক্রি করে দেন। এতে উজান ও ভাটি উভয় এলাকার হাঁস চাষীরাদেনই আয় বাড়ছে।

নীলফামারি জেলার চেরেঙ্গা গ্রামের নিম্ন আয়ের চাষী কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বেগুন চাষ শুরু করে প্রচুর লাভ ক'রে তারপর দুধেল গাভী ও ছাগল কিনে আরো আয় বাড়িয়েছেন। আর এই জেলারই গুড়গুড়ি গ্রামের অত্যন্ত নিম্ন আয়ের লোকেরা বাইরের কোন ঋণ ছাড়াই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করে গ্রুপ-ভিত্তিক মাছ চাষ ক'রে প্রচুর আয় বাড়িয়েছেন।

জলঢাকা উপজেলার কৃষি ব্যাংকের সহায়তায় অত্যন্ত নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্যরা ৯ টি দল গঠন করে সর্বমোট ২,১৬,০০০ টাকা ঋণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন এবং মৎস্য চাষ শুরু করে, এবং এই পরিবারগুলোর ভাগ্যের চাকা দ্রুত ঘুরে যায়। উদ্যোগটির ফলে গ্রামের অন্যান্য নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিও উপকৃত হতে থাকে - বাড়তি কাজের সৃষ্টি হয়, ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি পায়, মাছ ধরার জাল তৈরী ও বিক্রির ব্যবসা প্রসারিত হয়, গ্রামের বেকার যুবক যুবতীরা সরকারী দফতর থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ যেমন উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন এবং গোবরের ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব গ্যাস উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। মধ্যসত্বভোগীদের পাশ কাটিয়ে কিছু চাষী তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজেরাই মজুত ক'রে সরাসরি বাইরে বিক্রি করা শুরু করেছেন, এবং এই ব্যবসাকে তারা নাম দিয়েছেন "রাখি ব্যবসা" ("আমরা নিজেরাই রাখি")।

রংপুর জেলার *শ্রীপুর* গ্রামের স্বল্প আয়ের এক যুবক মাত্র ৭০ টাকায় পেয়ারা বীজ কিনে তা দিয়ে নিজের বাসস্থানের জমিতে পেয়ারা উৎপাদন শুরু করে। তার বাবা তাকে ১৩০০ টাকা দেন একটা সাইকেল কেনবার জন্য, সেটা না কিনে রানা এই টাকা তার নার্সারি প্রসারের জন্য খরচ করে। তার আয় বাড়তে থাকে এবং পরবর্তীতে নার্সারীর এলাকা বৃদ্ধির জন্য রানা ৬ বিঘা জমি কেনে। এক দশক পরে এখন রানা দুটি বড় নার্সারির মালিক হয়েছে যেখানে এখন ছয়জন নিয়মিত শ্রমিক এবং আরো কয়েকজন কামলা কাজ করে, এবং যে নার্সারি থেকে মাসে ৯-১০ হাজার টাকা আয় হচ্ছে।

এছাড়া দারিদ্রে পতিত মানুষদের নিজস্ব গ্রুপ-ভিত্তিক সঞ্চয়-ঋণ উদ্যোগের মাধ্যমে, এমনকি ঋণ ছাড়া শুধু বাইরে থেকে কারিগরি সাহায্য নিয়ে, দারিদ্র থেকে উঠে আসবার বহু উদ্যোগের প্রতিবেদন রয়েছে। এদের মধ্যে আছে বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মহিলারা যাদের কাছে বাইরের ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছায় না, কিম্বা তা তারা নিতে আগ্রহী নন্, তাদের "মুষ্টিচাল সমিতি" গঠনের কাহিনি। আরো আছে খুলনার ফুলতলা বাজারের ৯৬ জন সদস্যের "ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের" কাহিনি যে প্রকল্প সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদন ও ব্যবসামূখী ঋণ ছাড়াও আপদকালীন ঋণ দেয়। বিশেষ অভাবের সময় বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে গেলে প্রকল্পের সদস্যদের ধান বীজ ও খৈল কেনার জন্য বিনা সুদে ঋণ দেয়া হয়। এই সমিতির একটি পেনশন স্কীমও রয়েছে, এবং সমিতির সদস্যদের মেধাবী ও নিম্ন আয়ের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

কোন রকম ঋণ ছাড়া শুধু বিজ্ঞানের ব্যবহার দিয়ে জামালপুর শহরের *বেলতিয়া* ব্লকের ৬টি গ্রামে মহিলাদের ৭০টি এবং পুরুষদের ২০টি সমিতির ১৩৫০ জন সদস্য কৃষি সম্প্রসারণ

বিভাগের এক নিবেদিত ব্লক সুপারভাইজারের কাছে উন্নত পদ্ধতির চুলা তৈরি শিখে গ্রামের ঘরে ঘরে যেয়ে ১০০ টাকার বিনিময়ে একটি করে উন্নত চুলা তৈরি করে দিয়ে তাদের আয় বাড়াচ্ছেন ও গ্রুপ-সঞ্চয় করছেন। চুলা তৈরীর আয়ের টাকা দিয়ে সদস্যরা নিজ নিজ বাড়ির উঠানে/আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করেও আয় করছেন এবং বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছেন।

নীলফামারী জেলার *খলিশাপানি* গ্রামের মরিচ চাষিরা ফড়িয়াদের পাশ কাটিয়ে নিজেরাই সংগঠিত হয়ে গ্রামে একটি বাজার স্থাপন করেছেন। চাষিদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাজারটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। এন,জি,ও 'কেয়ার' এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনায় তাদের পরামর্শ দিচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি থেকে আয় নিজেরাই রেখে দেবার "রাখি ব্যবসা"র-এর এটি আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

যশোরের শারশা উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের তরুণদের দিয়ে শুরু একটি ব্যাতিক্রমধর্মী পাবলিক লাইব্রেরী চলে স্থানীয় শিক্ষক ও গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং স্থানীয় লোকদের, অত্যন্ত নিম্ন আয়ের লোকদেরো, চাঁদায়। এই লাইব্রেরি শুধু দীর্ঘমেয়াদে ছাত্র-ছাত্রীদের বইঋণই দিচ্ছে না, চাষীদের চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তিতে শিক্ষা দিচ্ছে, এবং মাছচাষে ট্রেণিং, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনায়ন, বাৎসরীক চক্ষুক্যাম্প সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সচেতনতা-বৃদ্ধি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরতে যাদুঘর স্থাপন - এসব কিছুই এই লাইবেরীর কার্যক্রমের অংশ। এই ইউনিয়নের প্রত্যেক স্কুলেই একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে এই লাইব্রেরীর শাখা গড়ে উঠেছে এবং স্কুলের শিক্ষা বিস্তারে লাইব্রেরীর কর্মীরাও পাশে থাকেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার *বটতলা* গ্রামের এক তরুণ যাকে টাকার অভাবে তার বাবা লেখাপড়ার খরচ দিতে পারেননি, ১৯৬৯ সালে দই বিক্রির টাকা থেকে গ্রামে একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলা শুরু করেন। তাঁর স্বপরিচালিত এই লাইব্রেরি থেকে প্রতি বছর ১০০-১৫০ জন নিম্ন আয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য বই ধার দিয়ে তিনি আজো তার নিজের লেখাপড়ার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করে চলেছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যারা তার লাইব্রেরী থেকে বই ধার নেয় তারাও নিজেরা কোন বই কিনলে তা প্রয়োজন শেষে এই লাইব্রেরীতে দান করে দেয়।

দেশের নানান স্থানে তরুণদের সমাজ-সেবার অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টান্তের প্রতিবেদন রয়েছে - "কবর খনন সংস্থা", "চলমান ডাস্টবিন", পাঠাগার স্থাপন ও তার পরিচালনা, আর্তদের সেবা, রক্তদান সংস্থা স্থাপন ও তার পরিচালনা, ইত্যাদি নানাবিধ সমাজ-সেবায়

আত্মনিয়োজিত তরুণরা দেখাচ্ছে যে এদেশের তরুণদের মূল্যবোধ যে-সব তরুণ দেশের কলুষিত রাজনীতির শিকার শুধু তাদের দিয়ে বিচার করলে কতবড়ো ভুল হবে।

এরকম আরো অনেক সৃজনশীল উদ্যেগের প্রতিবেদন রয়েছে, যেমনঃ
- স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা কিংবা ভরণপোষণে অক্ষম স্বামীর স্ত্রীদের আত্মসম্মানের সঙ্গে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামের কাহিনী। অনেক নিম্ন আয়ের মা স্বামী হারিয়ে কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে নতুন করে বিয়ে করেননি তাদের সন্তানদের নতুন ঘরে অনিশ্চিত অথবা দুর্ব্যবহারের মধ্যে জীবন যাপন থেকে বাঁচাবার জন্য, এবং নিজেদের তথাকথিত 'মৌলিক চাহিদা’ ছেড়ে দিয়ে একাগ্রমনে সন্তানদের মানুষ করবার জন্য জীবনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন।
- নিম্ন আয়ের পরিবাররা স্বেচ্ছাধর্মী উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের শিশু সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল স্থাপন করে নিজেরাই তা পরিচালনা করছেন ।
- গান, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, ব্লক ডিজাইন, বাঁশ এবং মাটির শিল্পকাজ, কাপড়ের ডিজাইন, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন - এরকম কাজের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মানুষরা তাদের নান্দনিকতা এবং নতুনত্বের তৃষ্ঞা পূরণ করছেন অন্যরকম কাজ করে বেশি আয় করবার পথে না গিয়ে, এবং এভাবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ”রুপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম” এই বাণীটির যথার্থতা প্রমাণ করছেন। এরকম শিল্পীরা কেউ কেউ নিম্ন আয়ের ঘরের অন্য শিল্পমনা তরুণদের বিনা পয়সায় শিল্পকাজ শেখাচ্ছেনও । এ ধরণের শিল্পীরা নিজেরা অতন্ত্য সাধারণ জীবন যাপন করেন, এবং কেউ কেউ বেশি রোজগার করবার চাইতে ঢাকায় তাদের শিল্প কর্মের প্রদর্শণী দেবার স্বপ্ন দ্যাখেন। ।
- একজন অন্ধ মানুষ যিনি ঘরে ঘরে যেয়ে শ্রোতাদের গান শুনিয়ে অল্প যা পান, মাঝে মাঝে তাতে স্ত্রীর সঙ্গে অভুক্ত থাকতে হলেও, তাই নিয়েই তৃপ্ত - ভিক্ষা করে এর চাইতে বেশী রোজগারের পথ প্রত্যাখ্যান করে -, কারণ এই পেশায় তিনি আর সকলের সঙ্গে *চেয়ারে বসবার সম্মান* পান ।
-একজন রিকশা চালক-শিল্পীর একটি স্বপ্ন পুরণ করবার চেষ্টার মর্মস্পর্শী কাহিনি - রিকশা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে মাটি দিয়ে অসাধারণ সুন্দর দালান-ঘরের মডেল তৈরী করে বিক্রি করেন আর স্বপ্ন দেখেন যে, দূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো তিনি তার মডেল বিক্রির টাকা দিয়ে ওরকম দালান বাড়ির মালিক হবেন।
- ‘প্রতিবন্ধী’ বলে আমরা যাদের অসম্মান করি - যারা আসলে জীবনে “বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত ব্যক্তি” (কুষ্টিয়ার এরকম মানুষদের এক সংগঠনের নেতাই ”প্রতিবন্ধী” কথাটা প্রথ্যাখ্যান করে আমাকে বলেন-যে ”বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত” এই কথাটি তাকে একটা শক্তি দেয়) - এ ধরণের মানুষদের আত্মসম্মানের সঙ্গে শারীরিক অসুবিধা মোকাবিলা করবার এবং তাদের অদম্য জীবন সংগ্রামের অনেক প্রেরণাময় কাহিনী রয়েছে, যেমন পা কিংবা কনুই দিয়ে কলম ধরে লিখে স্কুলে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষালাভ - জীবন সংগ্রামের এরকম বীরত্বের

উদাহরণ আশেপাশের অতি নিম্ন আয়ের পরিবারদের শারিরীকভাবে স্বাভাবিক সন্তানদেরও অনুপ্রেরণা দিয়েছে শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে।

এবং এরকম আরো অনেক উদ্যোগের কাহিনি রয়েছে সাংবাদিকদের এই প্রতিবেদনগুলিতে যা থেকে সন্দেহাতীতভাবে এদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণাময় পরিচয় পাওয়া যায় ।

৩.
দারিদ্র্যের প্রত্যয়

"সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমান মর্যাদা ও অধিকারের দাবীদার" (বিশ্ব-মানবাধিকার ঘোষণা, আর্টিকেল ১)

"সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সত্যের আহবান", কালান্তর)

জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এরকম বাস্তব ঘটনাগুলো "দারিদ্র" সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করে এবং দারিদ্র "বিমোচন" তথা উন্নয়ন-এর চ্যালেঞ্জকে পুন:পর্যালোচনা করতে আহ্বান করে। আমরা এখন এই আলোচনায় আসি।

এদেশের দারিদ্র ডিসকোর্সের মূলধারা আমি যাকে "গবাদি-পশু-সংস্কৃতি" বলে অভিহিত করেছি (রহমান, মো: আনিসুর, ২০০৪) সেই সংস্কৃতি অনুসরণ করে চলেছে। এটি তথাকথিত 'মৌলিক চাহিদাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী' (বিশ্ব ব্যাংক ২০০৬, মাহমুদ ২০০৬), যাতে মৌলিক চাহিদার মধ্যে ধরা হয় মুলত: নির্দিষ্ট পরিমান ক্যালোরি, আর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য কিছু রবাদ্দ। আন্তর্জাতিক তুলনার জন্য "দিনে এক ডলার" করে বরাদ্দটা চালু হয়ে গিয়েছে যে মানদন্ডটি প্রথমে বিশ্ব ব্যাংক চালু করে (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৬: সরণী ৩.১) এই ধরণের 'মৌলিক চাহিদার ঝুড়ি' থেকে অতি প্রয়োজনীয় অনেক কিছু যে বাদ গিয়েছে তা সহজেই বলা যায়। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা যা বাদ গিয়েছে তা হলো শিক্ষার জন্য সত্যিকারের খরচ, মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের খরচ যা না হলে রাস্তায় দুবৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে; অতিথি সেবা, বিয়ের খরচ, ধর্মীয় উৎসব, অন্তেষ্টিক্রিয়া এবং বৃদ্ধাবস্থায় ভরণপোষণের খরচ। বিশেষ করে শেষেরটিকে বাদ দেয়া "দরিদ্র" মানুষকে গবাদি পশুর মতো দেখাটাই ইঙ্গিত করে, কারণ বৃদ্ধাবস্থায় তো এসব মানুষ আর কলকারখানা-ব্যবসার কাজে লাগে না! একথাও বলবার অপেক্ষা রাখে না যে মানুষ এরকম "মৌলিক চাহিদার

ঝুড়ি” নিয়ে তো চল্‌তে পারে না, তাকে অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৎ বা অসৎ যে কোনভাবে তার ঝুড়ি আরো বড়ো করতে হবে। আর মহিলারা তো এইটুকু সম্বল নিয়ে দুবৃত্তদের কাছ থেকে শারিরীক হামলা থেকে নিজেদের বাঁচাতেই পারবে না। তা ছাড়াও প্রশ্ন, একজন মানুষ কেন হাতে একটা ঘড়ি রাখবারও আশা করতে পারবে না, একটা টেলিফোন সেট রাখবার পয়সা না থাকলে অথবা আধুনিক জীবনযাপনের জন্য বাড়ীতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবার পয়সা না থাকলে নিজেকে দরিদ্র মনে করতে পারবে না? আরো মৌলিক মানবিক প্রশ্ন হলো সব মানুষই কেন আধুনিক সভ্যতার অংশীদার হতে পারবে না? রবীন্দ্রনাথ যেমন বলে গেছেনঃ

> *”যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির ... প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।”* (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ”বাতায়নিকের পত্র”, *কালান্তর*)

এরকম মাপকাঠি দিয়েই কি আমরা আমাদের স্বজাতি সব মানুষেরই দারিদ্র বিমোচনের হিসাব তথা দেশের উন্নয়নের পথে অগ্রগতির হিসাব করব না?

আসলে, মানুষের "মৌলিক চাহিদা”র ধারণাটা প্রথমে আসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র কাছ থেকে, যে ধারণাটার পেছনে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের মতোই একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। এই ধারণার দুটো অংশ ছিল, আই,এল,ও-রই ভাষায়ঃ

> ”প্রথমত:, এর মধ্যে আছে মানুষের ব্যাক্তগত ন্যুনতম প্রয়োজনের দ্রব্যাদি - পর্য্যাপ্ত খাবার, মাথা গোঁজবার স্থান ও কাপড়-চোপড়, এবং কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র ও যন্ত্রাদি। দ্বিতীয়ত:; এর মধ্যে আছে কিছু সরকারি সেবা যথা বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, যানবাহন ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুবিধা। ...মৌলিক চাহিদার ধারণাটা একটি জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কোন অবস্থাতেই এটি জীবনধারণের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজন দিয়ে নির্দ্ধারিত হবে না।...” (আই, এল, ও ১৯৭৬)।

মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে আই,এল,ও-র এই প্রস্তাব ফেলে দিয়ে (মনে হয় বিশ্ব ব্যাঙ্কের ’বাজার-অর্থনীতি’ দর্শনে কলুষিত অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রভাবে) মানুষের মৌলিক চাহিদার একটা ”পশুপালন” দৃষ্টিভঙ্গী এর জায়গায় বসে গেছে। এদেশের দারিদ্র ও দারিদ্র-বিমোচনের হিসাব-নিকাশও যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে এটি অত্যন্ত গ্লানিকর ঘটনা। সব মানুষেরই কি অধিকার নেই আধুনিক সভ্যতার অংশীদার হবার?

তা ছাড়া, এ বিষয়ে বিতর্কেরও অবকাশ নেই যে, দারিদ্রের ধারণা একটি আপেক্ষিক ধারণা, এবং সমাজের উপরের স্তরের ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র রেখাও স্বভাবত:ই ওপরে উঠে যাবে । কে অস্বীকার করবে যে, ঢাকা শহরের বস্তিবাসী লোকদের দারিদ্র বেড়ে যায় যখন তাদের বস্তির পাশের অট্টালিকায় ডিশ এন্টেনা এসে যায় ? আর প্রত্যেক গাড়ীর ড্রাইভারই ঈদের সময় তার স্ত্রীকে কমপক্ষে ১,০০০ টাকা দিয়ে একটি শাড়ী কিনে দিতে কি চায় না? আর আজকে মোবাইল ফোন সেট শুধু "সুশীল সমাজের" সদস্যদের হাতেই থাকবে এই দাবী করে কী আমরা কেউ নিরাপদে রাস্তা পার হতে পারব? আধুনিক সভ্যতার এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় উপকরনের অভাব কী মানুষের দারিদ্রের চেতনাকে প্রভাবান্বিত করে না?

অ-অর্থনৈতিক চাহিদা

"দারিদ্র-রেখা" সম্বন্ধে এধরণের আপত্তি ছাড়াও এদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে-উদ্যোগগুলি এই প্রকল্পে দেশের সাংবাদিকরা পেশ করেছেন তা দারিদ্রের ধারণা সম্বন্ধেই আরো মৌলিকভাবে চিন্তা করতে আহ্বান করে। এই প্রতিবেদনগুলি থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত দারিদ্রে পতিত মানুষেরও তীব্র অন্-অর্থনৈতিক চাহিদা থাকে যা তারা তাদের জীবনের কঠিন বাস্তবতায় অত্যন্ত কম আয় নিয়েও 'ন্যুনতম' অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির সব মেটাবার আগেই মেটাতে চাইতে পারেন। এরকম কয়েকটি অন্-অর্থনৈতিক চাহিদার উদাহরণ: পুরুষ আধিপত্যশীল সংস্কৃতিতে সুবিধাবঞ্চিত ক্ষমতাহীন নারীরা তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে অর্থনৈতিক চহিদার চাইতে অগ্রাধিকার দিতে পারেন; বিধবা পরিত্যক্ত নারীরা খুব অল্প আয় নিয়েও তাদের সন্তানের ভবিষ্যতকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার শিক্ষার জন্য নিজেদের 'মৌলিক' অর্থনৈতিক চাহিদা বিসর্জন দিচ্ছেন; অতি স্বল্প আয়ের মানুষরাও উচ্চ আয়ের পথ ত্যাগ করে তাদের শৈল্পিক এবং উদ্ভাবনামূলক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আর বিশেষ লজ্জার কথা, এদেশে অসংখ্য "অস্পৃশ্য" শ্রেণী আছে -"দলিত", "হরিজন,", 'মুচি', 'মুন্ডা', এরকম নামে পরিচিত শ্রেণী -, যাদের রাস্তার হোটেলে চা খেতে পর্যন্ত দেয়া হয় না। এদের কাছে তাদের "অস্পৃশ্য"তা নি:সন্দেহে তাদের দারিদ্রের একটি বড়ো পরিচয় যে-পরিচয় ঘোচাবার চাহিদাকে তাদের অনেকেই আর্থিক স্বচ্ছলতার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে পারে।

কিন্তু আমি নিজেই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সমাজ-কর্মীর কাছ থেকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি যে, *"এই অত্যন্ত দরিদ্র লোকদের, অন্য যা কিছু চাহিদা ও স্বপ্ন তাদের থাকুক না কেন, সব চেয়ে প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজন নয় কি?*

মানুষের চাহিদাকে ”আগে-পরে” করে সাজাতে হলে এটা সত্যিই একটা কঠিন প্রশ্ন। এখানেই আসলে মানুষের একেবারে মৌলিক চাহিদাগুলি বুঝতে অনেকেরই ভুল হয়েছে। চিলির ’বিকল্প নোবেল পুরস্কার’-প্রাপ্ত সমাজবিজ্ঞানি ম্যানস্‌ফিল্ড ম্যাক্স নীফ্ এবংতাঁর সহগবেষকগণ ”হিউম্যান স্কেল ডেভেলপমেন্ট” বা ”মানবিক মানদন্ডে উন্নয়ন” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> “মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো একটি সামগ্রিক ’সিষ্টেম’ হিসেবেই দেখা দরকার যেখানে চাহিদাগুলো ’আগে-পরে’ করে দাঁড়িয়ে নেই। এর অর্থ, একদিকে, কোন একটি চাহিদাই মৌলিকভাবে অন্য কোন চাহিদার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়; অন্যদিকে, বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতাও নেই... ’সিষ্টেমের’ চরিত্রই এই যে তার উপাদানগুলি যুগপৎভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা একটি অপরটির পরিপূরক, কিংবা একটির বিনিময়ে আর একটি দিয়েও কাজ চলতে পারে। এভাবে দেখার অবশ্য এক জায়গায় শেষ আছে - কোথাও একটা প্রাক্-সিষ্টেমিক সীমা আছে একথা মানতে হবে যার নীচে গেলে কোন একটি চাহিদার অপূর্ণতা এমন তীব্র হতে পারে যে সেটি পূরণ করবার চাপ অন্যান্য চাহিদাকে বা তাদের বিকল্পকে একেবারে *অবশ* (প্যারালাইজ) *করে দিতে পারে*।”
>
> ”অনাহারের কথা চিন্তা করলে হয়তো একথা বেশী পরিষ্কার হবে । যখন এই চাহিদাটি মেটাবার পথগুলো ভীষণভাবে বন্ধ হয়ে যায় তখন অন্য সব চাহিদা সরে যেয়ে এই চাহিদাটাই তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু এ ধরণের অবস্থা শুধুমাত্র অনাহারের বেলাতেই হয় না, অন্য চাহিদার বেলাতেও এরকম হতে পারে। ... মানুষ যদি একেবারে স্নেহ-বঞ্চিত হয় অথবা তার যদি সমাজে কোন পরিচয়ই না থাকে তাহলে সে চরম আত্মহননেও প্রবৃত্ত হতে পারে (Max-Neef *et al*: পৃষ্ঠা ৪৪)

আমাদের কামরা-ভাগ-করা (’কমপার্টমেন্টালাইজ্‌ড)’ শিক্ষাব্যবস্থায় সিষ্টেমিক প্রত্যয় বিশ্লেষণ করবার সংস্কৃতি ও শিক্ষা নেই, কিন্তু মানুষের জীবন তো কামরায় ভাগ করা নয়, এর বিশ্লেষণ শুধু ট্রেণের এক কামরায় বসে থাকলে হয় না। এজন্যই মার্কসও বলেছিলেন বিজ্ঞান অনেকগুলি নয় - একটিই, এবং সেটি হলো ”হিউম্যান সায়েন্স” - মানব-বিজ্ঞান। কতবড়ো সত্য ও মূল্যবান কথা!

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগের প্রতিবেদনগুলি মানুষের চাহিদাকে আগে-পরে হিসাবে না দেখে একটি সিষ্টেমিক চাহিদা-সমষ্টি হিসাবে দেখার পক্ষে স্পষ্ট রায় দেয়। একজন ক্ষুধার্ত নারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তার ক্ষুধার্ত শিশুর জন্য এক বাটি

ভাত বড়ো না দুর্বৃত্তের হাত থেকে তার নিজের সম্মান বাঁচানো বড়ো। বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর কি বিভিন্ন হতে পারে না? কিংবা একই নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বাস্ত বভাবে এরকম কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে কি তার উত্তর বিভিন্ন হতে পারে না, যে উত্তর নির্ভর করবে ঠিক সেই সময় তাকে 'প্যারালিসিস্'টা কোনখানে আঘাত করছে? একইভাবে, একজন ক্ষুধার্ত 'অস্পৃশ্য' বলে অভিহিত মানুষকে যদি রাস্তার কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে খাবার ছুঁড়ে দেয়া হয় ঠিক সেই সময় তার প্যারালিসিসটা তাকে কোথায় আঘাত করবে তা কি আমরা আগে থেকে বলতে পারি?

অথবা, প্যারালিসিসের শক্ত কথা বাদ দিয়ে যদি 'জ্বরের' কথায় আসি, একজন ছবি আঁকা নিয়ে পাগল শিল্পী একটা ভালো চাকরী যেখানে ছবি আঁকবার সময় সে পাবে না, আর অন্য একটা চাকরি যেখানে সে টাকা কম পাবে কিন্তু ছবি আঁকবার সময়ও পাবে যাতে সে একদিন ঢাকায় তার ছবির একটা প্রদর্শনী দেবার আশা রাখতে পারে, এরকম দুটি চাকরীর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার সুযোগ পেলে সে কোন্টাকে বেছে নেবে তা কি আমরা আগে থেকে বলতে পারি? নদী ও বর্ষাস্নাত বাংলাদেশ কি সহজাতভাবেই কবি ও গায়কের জন্ম দেয় না যারা কম রোজগার করতে হলেও কবিতা রচনা ও গান ছাড়তে রাজী হবে না? একজন মা তার সন্তানের শিক্ষার খরচ যোগাতে তার নিজের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অনেকটাই তো প্রয়োজন হলে ছেড়ে দেবে, অর্থাৎ শুধু তাকে তার "মৌলিক প্রয়োজনের ঝুড়ি" টা দিলে তার থেকে সে নিজের প্রয়োজনের চিন্তা ছেড়ে তার সন্তানের প্রয়োজনের জন্য কী 'চুরি' করবে না। সেই অন্ধ গায়ক এবং তার স্ত্রী যে মাঝে মাঝে না খেয়ে থেকেও গান গেয়ে যাচ্ছে এতে তারা মানবিক সম্মান পাচ্ছে বলে, এই ব্যাপারটাও তো চিন্তা করবার মতো। সেই মাটির দালানের মডেল তৈরী-কারক শিল্পি-রিক্সাওয়ালা যে তার কাদা মাটির তৈরী দালানের মডেল বিক্রীর টাকা সঞ্চয় করে যাচ্ছে এই টাকা জমিয়ে কোনদিন নিজে এরকম একটা দালানে বাস করতে পারবে এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে যে স্বপ্ন হয়তো কোনদিনই সফল হবে না, আর এদিকে তার পবিরারের মৌলিক চাহিদাগুলো অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে তার এই বিচারও তো মানুষের মনে তার চাহিদাগুলো 'আগে-পরে' করে সাজানো থাকে না, সিস্টেমিকভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। আর একটা বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে বিষয়টিকে দেখতে গেলে, অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মানুষ তার বস্তুগত দারিদ্র্য ভুলে গিয়েই লড়াই করেছে এবং জীবন দিয়েছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য, এইজন্য যে এইখানেই চুড়ান্ত সময়ে তাকে প্যারালিসিস্টা আঘাত করেছে।

দারিদ্রের মোকাবিলা

দারিদ্রের এরকম সিস্টেমিক চরিত্র বিধায় দারিদ্র থেকে উত্তরণ ব্যাপারটা শুধুমাত্র মানুষের আয় বৃদ্ধির ব্যাপার নয়। মানুষকে অনেক রকম বঞ্চনা ও অমর্যাদাকর ও নিরাপত্তাহীন সামাজিক পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। এর জন্য শুধু অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল নয়, সামাজিক ধরণের নীতি-কৌশলেরও প্রয়োজন যে নীতি-কৌশল মানুষের সামাজিক চেতনা ও সংস্কৃতি উন্নত করবে, নারী-পুরুষের মধে ক্ষমতার বৈষম্য দূর করবে, এবং পেশা ও আয়-নির্বিশেষে সমাজে প্রত্যেক মানুষের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করবে।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা শূন্য ঋণ

এই প্রসঙ্গে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন এই যুগল লক্ষ্যে এদেশে প্রধান প্রধান যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পগুলি চলছে সেগুলির ওপর সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও এ্যাকশন এইডের যে মাঠ পর্যায়ে গবেষনা সদ্য শেষ হয়েছে তার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (খলিকুজ্জামান ও অন্যান্য ২০০৭)। এই গবেষনা দেখাচ্ছে যে এদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পগুলি অত্যন্ত চড়া কার্যকর সূদের জন্য এবং সাপ্তাহিক ঋণশোধের ও সঞ্চয়ের নিয়মের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের অসুবিধায় ফেলছে। একদিকে তারা সাপ্তাহিক ঋণশোধের নিয়মের জন্য প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা ধরণের কার্যকলাপেই ঋণের টাকা বিনিয়োগ করতে পারছে যার ফলে তারা দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে তাদের অবদান রাখতে পারছে না। অন্যদিকে এরকম কার্যকলাপে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করেও তারা অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো কিস্তির টাকা তুলতে পারছে না বলে পরিবারের অন্য খরচ, এমনকি, দৈনন্দিন খাবার খরচ, কমিয়ে, অথবা গ্রামীণ সূদী মহাজনের কাছ থেকে চড়া সূদে ঋণ নিয়ে, কিস্তির টাকা শোধ দিতে বাধ্য হচ্ছে। শোধ না দিতে পারলে তারা ঋণদান সংস্থার হাতে নানারকম হয়রানির সম্মূখীন হচ্ছে, যে-ধরণের ঘটনা অলিখিতভাবে জামানতবিহীন ঋণদানের দাবীকেই চ্যালেঞ্জ করে। আরো উদ্বেগের বিষয়, নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এসমস্ত ঋণ প্রকল্পের শতকরা একশ ভাগের কাছাকাছি ঋণগ্রহীতাই নারী হলেও দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষরাই নারীদের পাঠাচ্ছে তাদের নামে ঋণটা নিতে, আর তারপর সেই ঋণের টাকার দখল পুরুষদের হাতেই চলে যাচ্ছে, যেখানে এই ঋণ শোধ দেবার তাগাদার জন্য এই নারীদেরই নাজেহাল হতে হচ্ছে। আরো উদ্বেগের ব্যাপার হলো এই-যে পরিবারে এভাবে ঋণের টাকা আসছে দেখে এরকম পরিবারের কারো কারো মেয়েদের বিয়েতে বেশি যৌতুকও দিতে হচ্ছে, অর্থাৎ

ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে কিছু লাভ করতে পারলেও তা অন্য ফুটো দিয়ে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে!

ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে এরকম নানা ঝামেলার একটা কারণ চড়া সূদ ও সাপ্তাহিক কিস্তির নিয়ম, যার জন্য উপরোক্ত স্টাডিটি হিসাব করে দেখিয়েছে যে এরকম ঋণ ঋণদাতা সংস্থার জন্য অত্যন্ত লাভজনক একটা ব্যবসা এবং ঋণগ্রহীতার জন্য একটা নিরন্তর ঝামেলা; কিন্তু অন্য কারণ গ্রাম-বাংলার পুরুষ-শাসিত সমাজ, অর্থাৎ গ্রাম-মহিলাদের দারিদ্রের সিস্টেমিক (আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে) চরিত্রের জন্য তারা ঋণ নিয়ে সত্যিকারভাবে ক্ষমতায়িত হতে পারছে না তাদের নিজেদের দখলে ঋণের টাকা ও তা বিনিয়োগের ফসল রাখতে পারছে না বলে। এসমস্ত নানাবিধ কারণে এই ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে বিশেষ অবস্থাগত কারণে যে সব নারীর পক্ষে এরকম ঋণ ম্যানেজ করা সুবিধা মূলতঃ তারাই নিশ্চিতভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

অন্যদিকে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগের এই প্রতিবেদনগুলি দেখাচ্ছে যে মানুষের আর্থিক অবস্থা যতো খারাপই হোক তার একটা সৃজনশীলতা আছে যা দিয়ে সে ক্ষুদ্র ঋণ, বৃহৎ ঋণ, সব রকম ঋণই নিয়ে, বা কোনরকম ঋণই না নিয়ে, কোথাও বাইরে থেকে শুধু জ্ঞানভিত্তিক সাহায্য নিয়ে, কোথাও কোনরকম সাহায্যই না নিয়ে নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারে এবং শুধু ক্ষুদ্র ব্যবসা জাতীয় কাজে নয়, <u>উৎপাদন বৃদ্ধির</u> কাজেও। যেখানে এরা ঋণ নিচ্ছে সেখানে এই ঋণ তাদের প্রতি সপ্তাহে কিস্তি শোধ দেবার নিয়মে আট্‌কে ফেলছে না বলেই তারা এই ঋণ বিভিন্ন সময়কালীন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করতে পারছে। এভাবে ঋণ নিয়ে বা না নিয়ে তারা উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োজিত হয়ে শুধু নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এবং অন্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও অবদান রাখতে পারছে, এবং এভাবে এসব উদ্যোগ <u>একই সঙ্গে দেশে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন</u> দুই লক্ষ্যের দিকেই এগুচ্ছে।

<u>এই বক্তব্য ক্ষুদ্র ক্ষণের বিরুদ্ধে নয়</u>। তবে এই বক্তব্য ক্ষুদ্র ক্ষণকে অতি-মহিমামন্ডিত না করে সুবিধাবঞ্চিতদের নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে, প্রয়োজনমতো এবং ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা বিচারে ক্ষুদ্র বা মাঝারি বা বৃহৎ সব রকমের ঋণ নিয়েই, বা প্রয়োজন না হলে কোনরকম ঋণই না নিয়ে, নিজেদের ও সারা দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অর্থবহ অবদানের সুযোগ দানের পক্ষে। দেশের বহু স্থানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা নিজেরাই - মহিলা

গ্রুপ বা পুরুষ গ্রুপ বা মহিলা-পুরুষ একত্রে মিলে গ্রুপ - সংগঠিত হয়ে সঞ্চয় ও নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে, কোথাও গ্রুপের বাইরেও এরকম ঋণ দিচ্ছে। নিজেদের ঋণ-প্রকল্পে অবস্থা-বিশেষে তারা বিনা সূদে দু:স্থ ঋণও দিচ্ছে যে-ব্যবস্থা ঋণ-ব্যবসায়ী এন,জি,ও-দের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এসমস্ত ঋণ প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হলো যে এগুলির ব্যবস্থাপনা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজেদের হাতে, এবং এই কারণে এর থেকে লাভ সম্পূর্ণ তাদের হাতেই আসে। তদুপরি, কেউ ঋণ নিয়ে কোন কারণে চুক্তিমতো শোধ দিতে না পারলে গ্রুপের সদস্যরা, মানুষটি তাদের নিজেদেরই একজন বলে, ব্যবসায়ী নয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এরকম সমস্যার মোকাবিলা করে। একথাও অনস্বীকার্য-যে অনেক সুবিধাবঞ্চিত মানুষই তাৎক্ষনিকভাবে বড়ো ঋণ নিয়ে তার সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয় বিধায় অন্তত: প্রথম এক পর্যায়ে অনেকের জন্য ক্ষুদ্র ঋণই বেশি সুবিধাজনক হতে পারে। তবে এই ধারণা ঢালাওভাবে-যে প্রযোজ্য নয় তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, আর অনেক ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কিছু জ্ঞানভিত্তিক বা কারিগরি আইডিয়া, সহযোগিতা ইত্যাদি পেলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা বড়ো ঋণ নিয়ে বড়ো উৎপাদনমুখী প্রকল্পও সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পারে এরকম দৃষ্টান্তও বেশ কিছু রয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা কোথাও কোথাও ঋণ নিয়ে বা না নিয়ে উৎপাদনমুখী বা ছোট-বড়ো ব্যবসা-জাতীয় কর্মকান্ডের উদ্যোগ নিয়ে তার ফসল নিয়ে যৌথভাবে, তাদের সুন্দর ভাষায়, "রাখি বিজনেস" করছে - যেমন জলঢাকায় ও খলিশাপানিতে - এরকম দৃষ্টান্তগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফড়িয়া-ব্যাপারীদের হাতে ফসলের বড়ো একটা ভাগ তুলে না দিয়ে যৌথভাবে "রাখি বিজনেস" করতে পারলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দারিদ্র বিমোচন আরো দ্রুত হতে পারে একথা বলাই বাহুল্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বাজার-জ্ঞান, বাজারের লেন-দেন দক্ষভাবে করা, এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের এরকম উদ্যোগের বিরুদ্ধে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে যে-বাধা আসবে তার মোকাবিলা করবার জন্য, বাইরের বন্ধুস্থানীয় মহল থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে তো দেশের এন,জি,ওরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের সুবিধাবঞ্চিত মক্কেলদের শ্রমের ফসল বাজারজাত করবার কাজটা নিজেরাই "রাখি বিজনেস" করে করছে এর লাভটা নিজেরাই নিয়ে; এটি না ক'রে তারা যদি তাদের মক্কেলদের "রাখি বিজনেস" করবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেন (যেমন খলিশাপানিতে 'কেয়ার' এরকম সহায়তা দিচ্ছে) তাহলে সত্যিকারের বন্ধুর কাজ হবে। মানুষের প্রয়োজনমতো ঋণ পাবার অধিকার স্বীকার করেও "ঋণ মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার" এই প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের বদলে "নিজের শ্রমের ফসল নিজে রাখবার অধিকার" এই কথাটা বেশি মানবিক নয় কি।

অন্যান্য দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন কৌশল

বিভিন্ন এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা নিজেরা দেখাচ্ছে যে তারা যে অবস্থায় আছে তাতে যেখানে একার প্রচেষ্টায় বেশীদূর এগুনো কঠিন সেখানে নানাভাবে যৌথ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারে। মানুষের নিজস্ব উদ্যোগের এই সমীক্ষায় একা অথবা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাবার জন্য, বিশেষ করে মানুষের যৌথ চিন্তা - যা সাম্প্রতিককালে রিইব-এর সহায়তায় "গণগবেষনা" নামে একটি আন্দোলনে দানা বাঁধছে - একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে দেখা যাচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে একত্রে নিজেদের সমস্যা বিশ্লেষণ করা এবং এগিয়ে যাবার পথ খোঁজবার জন্য এরকম যৌথ চিন্তার সুযোগ দারিদ্র-পীড়িত মানুষদের তাদের একাকীত্ববোধ থেকে মুক্তি দিয়ে এবং নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ক'রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তিও যোগাতে পারে যা সিস্টেমিক অর্থে তাদের দারিদ্র-কে সরাসরি উপশমও করে। এইজন্য গনগবেষণা ও গণকর্মশালা ইত্যাদির মতো সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সম্মিলিত চিন্তার বিভিন্নরকম ফোরামের ব্যবস্থা করা দারিদ্র মোকাবিলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে বিবেচনার যোগ্য।

দারিদ্র মোকাবিলার জন্য আর একটি সহজ কৌশল হলো সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিজেদের সফল উদ্যোগগুলি অন্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দেখাবার ব্যবস্থা করা - এরকম মানুষদের পরস্পরের মধ্যে স্টাডি-টুর এবং তাদের মধ্যে পারস্পরীক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগীতার ব্যবস্থা করে দিয়ে - অর্থাৎ "গনমানুষদের নিজেদের মধ্যে উন্নয়ন-সহযোগীতা"র প্রসারে সাহায্য করা। এক জায়গার ইতিবাচক উন্নয়ন-কৌশলের দৃষ্টান্ত দেখে অন্য জায়গায় এরকম উদ্যোগ নেবার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত এই প্রতিবেদনগুলিতেই রয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষ যাদের তেমন ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা নেই বলে নতুন ধরণের কোন উদ্যোগ নিতে স্বভাবতই দ্বিধা করবে, তাদের কোন নতুন উদোগ নিতে প্রণোদিত করবার জন্য অন্য স্থানে এরকম সফল উদ্যেগের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার চাইতে ভাল আর কোন কৌশল নেই।

আর দারিদ্র বিমোচনের পথে এগিয়ে যেতে দেশের তরুণ-তরুণী সহ অবস্থাপন্ন মানুষদের কাছ থেকেও স্বেচ্ছাসেবামূলক অনেক অবদান প্রয়োজন - তারা সুবিধাজঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে কাজ করে তাদের প্রেরণা দিতে পারেন, তাদের কাছে বিভিন্ন কারিগরি ব্যাপারে, তথ্যাদি ব্যাপারে, জ্ঞান নিয়ে যেতে পারেন, বিভিন্ন রকম যোগাযোগ ব্যাপারে তাদের সাহায্য

করতে পারেন, এবং সর্বোপরি তাদের দু:সময়ে তাদের পাশে থেকে তাদের শূধু হাতও ধরতে পারেন যার মূল্য তাদের কাছে অনেক, যেরকম অবদান কিছু কিছু অবস্থাপন্ন মানুষ রেখে চলেছেন। এব্যাপারে বিশেষ করে দেশের কিছু কৃষি অফিসারের অত্যন্ত ইতিবাচক সমাজপ্রেমী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশের অনেক স্থানে যুবক-যুবতীরা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এটিও তুলে ধরবার মতো কথা। এরকম সমাজসেবা যা স্বত:স্ফূর্তভাবেই হচ্ছে এটি দারিদ্র বিমোচনের জন্য একটি বড়ো সম্পদ যা বিভিন্ন সৃজনশীল পদ্ধতি দিয়ে আরো বাড়ান যায়।

"গ্লাশের অপর অংশের" সমস্যা

এভাবে দেশে দারিদ্র বিমোচনের তথা উন্নয়নের কাজ চলতে থাকলেও সমাজের বিরাট অংশের দারিদ্র-তো বহুকাল থেকেই যাবে, এবং যাদের থেকে যাবে তারা বর্তমান সমাজ-ব্যাবস্থার ওপর আস্থা রাখবে কী করে। এই সমস্যাটি - "গ্লাশের বাকী অংশের" প্রশ্নটি -, চল্‌তি দারিদ্র বিমোচন ডিসকোর্সে উপেক্ষিত হয়ে আছে। দেশের জনগোষ্ঠীর এই অংশের একটি বড়ো ভাগের দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করবার, এবং আসামাজিক কার্যকলাপ অথবা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবার, প্রবণতা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং এই প্রবণতাকে সামাজিক বঞ্চনাময় জীবনের আশু উন্নয়নের আশা দেখতে না পাবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বোঝা প্রয়োজন।

আরো বোঝা প্রয়োজন যে "গ্লাসের বাকী অংশটা" কোন স্থির সংখ্যা নয় যাকে একটু একটু করে কমিয়ে এক সময় শেষ করে ফেলা যায়। দারিদ্র একটি গতিময় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া একটা নিপীড়নমূলক সামাজিক কাঠামোতে ক্রমাগতই সৃষ্ট এবং পুনর্সৃষ্ট হচ্ছে। এটা জানা কথা যে, প্রতাপশালী গোষ্ঠীর সদস্যরা নানারকম অসৎ উপায়ে, অনেক সময় বলপ্রয়োগ করে, সমাজের দুর্বল অংশের সম্পদ - জমি, বাড়ি ও অর্থসম্পদ - আত্মসাৎ করে চলেছে এবং এইভাবে তাদের দারিদ্রে ফেলে দিচ্ছে আগে তারা এই অবস্থায় না থাকলেও কিম্বা এই অবস্থা থেকে উঠে আসলেও। কোন সঞ্চয় ছাড়া হঠাৎ বড় ধরণের কোন খরচের প্রয়োজন হলেও মানুষ নতুন ক'রে দারিদ্রে পতিত হয়। সাম্প্রতিককালে দারিদ্র পুনর্সৃষ্টির এরকম প্রক্রিয়ার ওপর "ক্রনিক পভার্টি রিসার্চ সেন্টার" বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত মূল্যবান গবেষনা করছে যার সঙ্গে এদেশের "বি,আই,ডি,এস"-ও জড়িত আছে (ডেভিড্ হিউম্ ২০০৫)।

এটাও জানা কথা যে, বর্তমানে দেশের সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বড়ো আকারের ঋণের সুবিধাগুলো দেশের ধনীক শ্রেণীরাই পেয়েছ। বিদেশী সম্পদ যা এসেছে তাও মূলতঃ এই শ্রেণীদের হাতেই গিয়েছে। এও জানা কথা যে, দেশ ও বিদেশের সম্পদের এই বন্টনের প্রধান ফল উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নয়, বরং (ক) ব্যক্তিগত ধনবৃদ্ধি এবং (খ) জাঁকজমকপূর্ণ ভোগ বিলাসে ব্যয় হচ্ছে। এভাবে দেশের সঞ্চয় শুধু উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়েই নেয়া হয় নি, সমাজের ভোগের প্যাটার্নকেও বিকৃত করেছে, এবং এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক সঞ্চয় প্রবণতা নীচের দিকে নিয়ে গিয়েছে। আর এভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারায় দেশের ধনী সম্প্রদায়ের যে রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তি বেড়েছে তা ব্যবহার করে তারা দারিদ্র সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টিতে আরো অবদান রেখে যাচ্ছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষগুলো তাদের স্বল্প আয় থেকেই সুবিধা ও প্রেরণা পেলে সঞ্চয় ক'রে এককভাবে অথবা যৌথভাবে নানামুখী উৎপাদনমুখী প্রত্রিয়ায় বিনিয়োগ করছে। এর থেকে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যের কোন বিরোধ নেই, এবং শুধু প্রবৃদ্ধি বাড়াবার জন্যই দেশের সম্পদ এবং প্রয়োজনে কারিগরী সহায়তা সমাজের নীচু আয়ের মানুষের হাতেই অগ্রাধিকার হিসাবে কিংবা অন্ততঃ সমান অংশীদার হিসাবে দেয়া উচিত।

দারিদ্র্য সৃষ্টির উপরোক্ত ধরণের নানাবিধ প্রক্রিয়া যতদিন চলতে থাকবে ততদিন দারিদ্রে পতিত কিছু কিছু করে মানুষদের আয় একটু একটু করে বাড়িয়ে সমাজের দারিদ্রের মোকাবিলা করবার চেষ্টা করাটা নীচে-গড়িয়ে-চলমান সিঁড়ি (এস্ক্যালেটার) দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করবার মতো। এভাবে সমাজের দারিদ্র কখনোই দূর হয় না যদি এস্ক্যালেটরটার সুইচ্ অফ্ করে না দেয়া যায়। মার্কিন আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও এস্কেলেটারটি নীচেই নামছে, এবং সম্প্রতি এদেশে "তীব্র দারিদ্রের" অগ্রগতি নিয়ে সেদেশের বিভিন্ন মহলে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ শুরু হয়েছে (পিউগ ২০০৭)। এই এসক্যালেটরের নিম্ন গতি সুইচ্ অফ্ করার ব্যাপারটা, এবং দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দেশের উন্নয়ন কাজে বড়ো অংশীদার করে একই সঙ্গে দ্রুততর গতিতে দারিদ্র বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো, দেশের সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রশ্ন। এদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতিতে তো একটা সমতাবাদী সমাজ গড়বার কথা ছিল, আর দেশের গঠনতন্ত্র স্বাধীনতার পর ক্রমাগত মার খেলেও তো এই প্রতিশ্রুতি "আর্থসামাজিক ন্যায়-নীতি"র ব্যাজ লাগিয়ে আজো এই গঠনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতি হয়েও চরম অবহেলায় ধুলায় পড়ে আছে। দেশটা আজকে-যে বিধ্বস্ত গনতন্ত্রের নর্দমা থেকে উঠে গায়ের পাঁক পরিষ্কারের

চেষ্টা ক'রে সামনে এগুবার চেষ্টা করছে এই চলায় এই সমতাবাদী নীতিটি তার যোগ্য সম্মান পাবে কিনা এটাই বোধ হয় আগামি দিনে দেশের উন্নয়ন-প্রশ্নের সবচেয়ে মানবিক জিজ্ঞাসা।

৫.
অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন দর্শন

"কম্যুনিটির প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে, শুধু যে-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের মুক্ত ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব" - ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইট্স, আর্টিক্‌ল ২৯(১) ।

"তোমার দেশ তোমার জন্য কি করতে পারে তা জিজ্ঞেস কোরো না; জিজ্ঞেস করো তুমি তোমার দেশের জন্য কি করতে পারো ।" - জন.এফ.কেনেডি ।

সবশেষে, অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন দর্শন নিয়ে কয়েকটি কথা যা এদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জীবনাবস্থা ও তাদের সৃজনশীল উদ্যোগসমূহের চরিত্রের প্রেরিপ্রেক্ষিতে, তথা শুধু এদেশের নয়, সমস্ত দক্ষিণ বিশ্বের উন্নয়ন প্রশ্নের পরিপ্রোক্ষিতে, উত্থাপন করা প্রয়োজন ।

অমর্ত্য সেন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশকে উন্নয়নের দর্শনগত ভিত্তি বলে প্রস্তাব করেছেন (সেন ১৯৯৯)। এরকম দর্শন নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলা যায়ঃ

প্রথমতঃ, মানুষের "ব্যক্তিসত্ত্বা" জিনিষটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। মানুষ জন্ম নেয় সমষ্টির মধ্যে, এবং সমষ্টির সাহায্যে ও লালনে - প্রথমে পরিবার, নিকট ও দূর আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে গ্রাম- জীবনে পড়শিকুলের সদস্যদের কোলেও সে বেড়ে ওঠে। তার আরো বেড়ে ওঠা হয় বৃহত্তর সমাজের আঙ্গিনায়, পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রীয়ায়, কারো কারো এক সময়ে বিশ্বমঞ্চে। এইভাবে বেড়ে উঠে মানুষের নিজের স্বত্বার চেতনা ছোট-বড়ো অন্য মানুষগোষ্ঠীর স্বত্বার সঙ্গে, পরিবেশের (ইকলজি) সঙ্গে, কম-বেশি একাত্ম হয়ে যায়, যে একাত্মবোধ নিয়ে মানুষ নিজের পরিবারের জন্য, বৃহত্তর সমাজের জন্য, দেশের জন্য, সমস্ত বিশ্ব-মানবতার জন্য, পরিবেশের জন্য, ত্যাগ স্বীকার করে, তার জন্য প্রাণও দেয়। বিভিন্ন মানুষের আপন সত্বারই চেতনা এরকম বিভন্ন যৌথ স্বত্বার চেতনার সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় জড়িয়ে থাকে। এমনকি বিভিন্ন নতুন পরিবেশে, অভিজ্ঞতায় ও ঘটনায় মানুষের আপন সত্বার চেতনা বদলেও যায়, যেমন এক সঙ্গে বসবাস, একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে কোন

বিপদের মোকাবিলা করা, একসঙ্গে আর্তের সেবা করা, একসঙ্গে সংগ্রাম-আন্দোলন করা, একসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা ।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যেহেতু গল্পের 'রবিনসন ক্রুশো' নয়, একটি সামজিক জীব, তার 'ব্যক্তি' হিসেবে জীবনের তৃষ্ণাও অপরের - পরিবার, সমাজ, জাতি, বিশ্ব - মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার নিজের কাজ থেকে আত্মতৃপ্তিও সাধারণতঃ অপর কোন না কোন সত্বার কাছ থেকে স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল, এবং অপরের মতামত, অপরের কাছ থেকে সমর্থন - প্রশংসা-নিন্দা, সে বৃহত্তর সমাজ হোক বা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী বা নিজের পরিবার বা বন্ধুমহলই হোক - মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও নিজেকে বিভিন্নরকম কাজে নিয়োজিত করবার তাড়নাকে প্রভাবান্বিত করে। এজন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটির মধ্যে আপন ইচ্ছাধীন পথে চলতে পারবার অধিকারের যে ইঙ্গিত আছে সেই ইচ্ছাটিও কোন মানুষেরই একেবারে নিজস্ব ইচ্ছা নয়, কম-বেশি অপর দ্বারা প্রভাবিত ইচ্ছাই, এবং ব্যক্তির ইচ্ছার স্বরূপ নির্ভর করে একজন ব্যক্তি অপর কাদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে এবং অপর কাদের চিন্তা-মূল্যবোধ-কার্যকলাপ ইত্যাদি তাকে প্রভাবান্বিত করে।

এই দুটি কারণে মানুষের 'ব্যাক্তিসত্ত্বা', বা 'আমিত্ব', অপর সকল থেকে বিচ্ছিন্ন একটা সত্ত্বা নয়, এবং এই জন্য 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' কথাটি একটি ডিস্টিংটিভ্ প্রত্যয় হিসাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না যার ভিত্তিতে সমাজের উন্নয়ন-দর্শনকে দাঁড় করানো যায়। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সামাজিক মনোবিজ্ঞানে অনেক গবেষণা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন সমাজে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা-উপলব্ধীর মধ্যে বৃহত্তর কোন না কোন সত্ত্বা বা সত্ত্বাবলীর সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধীর আলোচনা রয়েছে (ট্রিয়ানডিস্ ১৯৮৮)।

এছাড়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশকে, তা যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, উন্নয়নের দর্শনগত ভিত্তি বলে দাবী করতে গেলে এরকম স্বাধীনতার মানবিক অর্থটিও স্পষ্ট হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি এই প্রশ্নে দুইজন সুইডিশ সমাজ-চিন্তাবিদ্ যেমন বলেছেন, *"ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্থহীন ও বিপজ্জনক যদি এটি কোন মূল্যবোধের মধ্যে গ্রথীত না থাকে এবং কোন সামাজিক ও 'আধ্যাত্মিক'(এখানে মানবিক মূল্যবোধ অর্থে এই কথাটি বুঝতে হবে) বিবেচনা একে আলোকিত না করে।"* (ব্যাকস্ট্র্যান্ড ও ইঙ্গেলস্ট্যাম ২০০৬, পৃ ১১৭)। মানব সভ্যতার সব যুগেই মানুষ বিত্ত ও ক্ষমতার জোরে নিজেদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাই জাহির ক'রে মানবতার প্রতি যেরকম ধ্বংসাত্মক আচরণ ক'রে এসেছে, এবং বর্তমান বিশ্বে এরকম আচরণ তার চূড়ান্ত বিভিষিকামূলক চরিত্র দেখাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্যের বোধ

হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অমর্ত্য সেন এরকম স্বাধীনতার জবাবদিহিতা "পার্টিসিপেটরি গণতন্ত্রের" কাছে দিতে চেয়েছেন (সেন, ঐ, পৃ ৯)। কিন্তু সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বন্টন অসম থাকলে, এবং বিত্তবানদের সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের "পেট্রণ-ক্লায়েন্ট" সম্পর্ক থাকলে, "পার্টিসিপেটরি গণতন্ত্র" সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না একথাও বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া এটি শুধুমাত্র 'সামাজিক দায়বদ্ধতার' প্রশ্ন নয়, এই প্রশ্নটি সমস্ত মানবতার (এমনকি ইকলজির) কাছে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। আজকে কিছু মানবিক মূল্যবোধ ও মানব-অধিকারের প্রস্তাব মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আলোকিত চিন্তার প্রভাবে বিশ্বস্বীকৃত, এবং যে কোন সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধের ওপরে এগুলির স্থান। বর্তমান সভ্যতার যুগে মৌলিক মানবাধিকারের কিছু মূল্যবোধ "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা"য় ("ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইট্স"- ইউডিএইচআর) স্থান পেয়েছে, যে ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানবতা যে-কোন সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধের কাছে ও তার কার্যকলাপের কাছে জবাবদিহিতা দাবী করছে।

এই দর্শনগত প্রশ্নগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য উন্নয়ন-প্রশ্নের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিকাশের সঙ্গে সমার্থক করে দেখবার প্রস্তাবটি বিশেষভাবে অবাস্তব এবং ক্ষতিকর। এদেশে একদিকে জনসংখ্যার তুলনায় জমি কম, ভবিষ্যতে আরো কমতে থাকবে, যার জন্য অনেক স্থানে জমির দখল নিয়ে তীব্র সংগ্রাম ও পরিবেশ-ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অনেকের পক্ষেই স্বল্প সম্পদ নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে আছে যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই যৌথ কর্মকান্ডের উদ্যোগ নিচ্ছে যেরকম বেশ কয়েকটি উদ্যোগের প্রতিবেদন এই সংকলনে পেশ করা হয়েছে। এদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং গন-কল্যানকর উন্নয়নের জন্য এরকম যৌথ কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এবং এপথেই এদেশে অনেক মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন হচ্ছে ও হবে। এভাবে এই উদ্যোগকারী মানুষদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশ হচ্ছে কিনা এই 'মার্কিন-কানাডিও-অষ্ট্রেলিও' জীবনদর্শনের প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর (এই দেশগুলিতে ব্যক্তিস্বার্থ-চিন্তা অন্যান্য দেশের চাইতে বেশি দেখা গেছে - হফস্টিড্ ১৯৮০; ট্রিয়ানডিস্ ১৯৮৮, পৃ ৩২৪ -, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষরাও মনে হয় জন এফ্ কেনেডির দেশ সেবার ডাকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল)। প্রশ্নটি হলো এভাবে এই মানুষগুলি তাদের নিজেদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা পূরণের পথে এগুচ্ছে কিনা, যে আশা-আকাঙ্খা তাদের নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শিক এবং সম্ভাবনা থেকে এবং তাদের মতো অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়াজাত তাদের নিজ নিজ আত্মচেতনা ও মূল্যবোধ থেকে জন্ম নিচ্ছে। এইভাবেই এদের মধ্যে "নিজেকে বাঁচাও, অন্যকে বাঁচাও" এই মুল্যবোধ জন্ম নিচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সাধারণ দইওয়ালাও দই বিক্রীর টাকা দিয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না বাড়িয়ে গ্রামের তরুণ-

তরুণীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামের নিম্ন আয়ের শিল্পী অন্য শিল্পমনা তরুণদের বিনা পয়সায় শিল্পকাজ শেখাচ্ছেন, দেশপ্রেমিক সরকারী কৃষিবিজ্ঞানীরা তাদের চাকরীর নির্দ্ধারিত দায়িত্বের রুটিন ছাড়িয়ে এবং নিজেদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জীবনে এগিয়ে দেবার জন্য দিন নেই রাত নেই তাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এসমস্ত মূল্যবোধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিকাশের মুল্যবোধ নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ থেকে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে এগুবার বা তাদের প্রতি সেবার হাত প্রসারিত করবার মূল্যবোধ, মানবতার সেবা করবার মূল্যবোধ। এরকম মূল্যবোধকে আরো প্রেরণা দেয়া এবং এর বাস্তব প্রকাশকে সহায়তা করাই এদেশের দারিদ্র বিমোচন তথা উন্নয়নের প্রধান পথ বলে আমি প্রস্তাব করি, এবং এদেশের গর্বের সন্তান অমর্ত্য সেনের কাছেও একই রকম মুল্যবোধ প্রত্যাশা করি।

সবশেষে, একথা বলা প্রয়োজন-যে আজকে-যে দারিদ্র-বিমোচনের জন্য সারা বিশ্বে আওয়াজ উঠেছে মানুষের এই দারিদ্রের চেতনা একটি আপেক্ষিক চেতনা - অপরের বিত্তের মানদন্ডেই মানুষ নিজেকে দরিদ্র মনে করে এবং মানুষকে দরিদ্র দেখায়। আদি সমাজে যখন মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য দানা বাঁধে নি তখন মানুষের খুব অল্প আয় নিয়েও দারিদ্রের চেতনা ছিল না - আজো এদেশের এবং অন্যান্য দেশের আদিবাসী সমাজে এই চেতনা নেই। তাই সমাজে বৈষম্য না কমলে মানুষের দারিদ্রের চেতনা কোনদিনই যাবার নয় - দারিদ্রকে একটা 'মৌলিক চাহিদার ঝুড়ি’ দিয়ে মেপে তা বিমোচনের পরিহাস সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষায় কোন কাজেই আসবে না। এদেশের সংবিধানে সমতাবাদী সমাজ গড়বার যে অঙ্গীকার আছে দারিদ্র বিমোচনের সত্যিকারের পথ সেই দিকেই। এপথে যেতে পারলে দেশের মানুষ তাদের দারিদ্রের কথা ভুলে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে নিজেদের এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট হবে, স্বাধীনতার পর পর যেমন দেশের নানা স্থানের মানুষ হয়েছিল। মার্কসীয় সমাজ-বিপ্লবের দর্শনও এই দর্শনই ছিল - মার্কস বলেছিলেন যে সমাজ-বিপ্লবের পরে শ্রমিক শ্রেণী তার নিজের ইতিহাস রচনা করবে, তার ’দারিদ্র’ দূর করবে একথা বলেন নি। মাও জে দুং-ও চীনে বিপ্লবের পরে বলেছিলেন ”চীন উঠে দাঁড়িয়েছে” - তিনি চীনের মানুষের দারিদ্র বিমোচনের জন্য একথা বলেন নি; বরঞ্চ আরো বলেছিলেন এখন ”সেই ’মূর্খ বৃদ্ধ’টি পাহাড় সরিয়ে দেবে” । রবীন্দ্রনাথও বলেছেনঃ

> *”দারিদ্র সমস্যাটি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। সুখের অভাবই বড়ো সমস্যা। সুখ প্রয়োজনীয় জিনিষের তালিকায় ধন-সম্পদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে না পারে, কিন্তু এ সৃষ্টিশীল, তাই এর নিজের ভিতরেই ধন রয়েছে।”*
> (Bandopadhyay 1989; ইংরেজী থেকে অনুবাদ)

বিশ্বের এরকম বড়ো সমাজ দার্শনিকরা সবাই মূলতঃ একই কথাই বলেছেন, যা হলো মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশই মানব-জীবনের লক্ষ্য। বাংলাদেশের মানুষরাও এই লক্ষ্যে এগিয়ে বিশ্বকে দেখাতে আগ্রহী-যে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে তাতে তাদের 'দারিদ্র' যতখানি এবং যে গতিতে বিমোচিত হোক্ না কেন, আর তাদের হাতে সেই ক্ষমতা আসলে তারা স্বভাবতঃই তাদের সব ব্যথার জায়গাগুলিতেই নিজ-নিজ বিচারজাত অগ্রাধিকার অনুযায়ী হাত দেবে । তাদের সম্মিলিত ক্ষমতায়ন ও তাদের সৃষ্টিশীলতার জয়যাত্রার পথে সমস্ত বাধা দূর করাই এদেশের উন্নয়নের লক্ষ্য হোক্ এটাই কাম্য ।

৬.
উপসংহার

আসুন আমরা এদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সৃজনশীলভাবে, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে, নিজেদের জীবনতৃষ্ণা মেটাবার উদ্যোগগুলির সঙ্গে পরিচিত হই, এদের উদ্যোগ থেকে প্রেরণা নেই। এদের আত্মসম্মনবোধ, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে জীবনসংগ্রাম, সৃজনশীলতা, কঠিন প্রতিকূল অবস্থাতেও হার স্বীকার না করে এগিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত, পারস্পরীক সহমর্মিতা ও ত্যাগ, এগুলি আমাদেরই মানবজাতির সদস্য হিসাবে গর্ব। এরা কারো কাছে ভিক্ষার অসম্মান চায় না, নিজেদের অনেক কষ্টের মধ্যেও অপরের কষ্টে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, এদের অনেকেই একা নিজের ব্যাক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য এগুতে না চেয়ে তাদেরই মতো সুবিধাবঞ্চিতদের হাত ধরে এগুতে চায়, এগুচ্ছে। অনেকে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও অর্থের পেছনে না ছুটে সংগীত ও কলার মধ্যে আত্মপূর্ণতা খুঁজছে, পরিবেশকে বাঁচাতে আত্মত্যাগ করছে । আসুন, আমরা এদের কাছে যাই তাদের হাত ধরতে, তাদের 'দারিদ্র বিমোচনের' জন্য 'টার্গেট' করে তাদের আত্মাকে হত্যা করতে নয়, তাদের আত্মশক্তিকে আরো বলীয়ান করতে তাদের আমাদের সাহচর্য দিয়ে, আমাদের কোন জ্ঞান যদি তাদের কাজে লাগে তা তাদের দিয়ে, তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পরের সংগ্রাম, জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতা থেকে আরো প্রেরণা ও সমৃদ্ধি নেবার সুযোগ করে দিয়ে।

দেশের যে সাংবাদিক বন্ধুরা এদের পরিচয় দেশবাসীর কাছে তুলে ধরবার জন্য দুবছর ধরে এদের খোঁজ করেছেন এবং এদের সংগ্রামের ও সৃষ্টিশীলতার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন

তারা দেশবাসীর কাছ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। শুধু তাই নয়, এরা এদেশে প্রচারমাধ্যমের সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন যার ফলে আমরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের মতো আজকে আবার প্রচারমাধ্যমে নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি এদেশের সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতা ও বীরত্বের কথা। এরা নিজেরাও বলছেন যে এই কাজের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক হিসাবে তাদের নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন চেতনা গড়ে উঠছে। তাদের এই নতুন ভূমিকার গুণে আজকে দেশের এক প্রান্তের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগের কথা অন্য প্রান্তে যেতে শুরু করেছে, অন্যদেরও এরকম উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেছে। আসুন আমরা এই সাংবাদিক ভাই-বোনদের এককণ্ঠে বলি-যে তাদের এই অবদান ও নতুন ভূমিকার জন্য দেশ অপেক্ষা করছিল।

জয় হোক্ সৃজনশীল বাংলাদেশের!

মো: আনিসুর রহমান

*রিইব-প্রকাশিত *সুবিধাবঞ্চিতদের সৃজনশীল উদ্যোগ অনুসন্ধান, প্রচার ও প্রসার (প্রথম খন্ড)* , কুররাতুল আইন তাহ্‌মিনা, শিশির মোড়ল ও প্রিসিলা রাজ। ২০০৮ পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে লিখিত।

রচনা-নির্দেশিকা

Ahmad, Q. K. (2007), *Socio-Economic and Indebtedness-Related Impact of Micro Credit in Bangladesh*, University Press Limited (UPL)/Bangladesh Unnayan Parishad (BUP)/ActionAid Bangladesh (AAB), Dhaka.

Ahsan, Shamim & Imran H. Khan (2005). "When school is all about having fun". *Daily Star Weekly Magazine.* 31 December pp 9-17.

Backstrand, Gordan and Lars Ingelstam (2006). "Enough! Global Challenges and Lifestyles". *What Next, setting the context. development dialogue* no 47. June.

Bandopadhyay, Binoy (ed.). *Rabindranather Shikshabhabna.* Bishnu Bosu and Pratibhash. Kolkata 1989

Hofsede, G. (1980). *Culture's Consequences*. Beverley Hills, CA: Sage.

Hulme, David (2005). *The Chronic Poverty Report 2004-2005.* Chronic Poverty Research Centre. www.chronicpoverty.org .

ILO (1976). *Employment Growth and Basic Needs: A One World Problem*. Geneva.

Mahmood, Manik (2006). *Gonogobeshona thekey amader shikkha. Report on PAR Experiences fopr sharing with RIB.* Research Initiatives, Bangladesh. Feb 2006 (mimeo.)

Mahmud, Wahiduddin (2006). "Employment, Incomes and Poverty: Prospects of Pro-Poor Growth in Bangladesh." Ahmed, Sadiq and Wahiduddin Mahmud (2006).

Maqsood, A.K.M. (2006). *Shamajer nijashsho shwarthey kajoli model shishu shikha bikash kendrogulor tikey thaka: ekti shamaj gabeshona.* Research Initiatives Bangladesh. Dhaka. September 12 (mimeo).

Max-Neef, Manfred, A. Elizalde and M. Hopenhayn (1989), "Human Scale Development: an Option for the Future" *Development Dialogue*, pp. 5-81.

Pugh, Tony (2007). " Severe poverty growing worse". Star Telegram. Feb 22. Star-Telegram.com

Rahman, Md. Anisur (2000). "Budget o Shamaj Bastobata" *Doinik Arthoniti,* Special Budget Issue, June.

Rahman, Md. Anisur (2004). "Globalization: The emerging ideology in the popular protests and grassroots action research". *Action Research* 2(1). March. pp 9-23.

Rahman, Md. Matiur (2006). *Participatory Action Research (PAR) in Development: An Anthropological Study in Nilphamary District of Bangladesh.* Research Report in Partial Requirement of Anthropology degree in M.S.S., Department of Anthropology, Rajshahi University, Rajshahi.

Sen, Amartya (1999). *Development as Freedom.* Oxford University Press.

World Bank (1996). *Poverty Assessments: A Progress review*. Washington, D.C.

Triandis, Harry C, Robert Bontempo, and Marcello J. Villareal (1988). "Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-Ingroup Relationships". *Journal of Personality and Social Psychology*. 54(2). 323-338.

World Bank (2006). *Targeting Resources for the Poor in Bangladesh.* Bangladesh Development Series. South Asia Human Development Unit. The World Bank Office, Dhaka. December.